International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-IV, January 2018, Page No. 06-22
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বিংশ শতাব্দীর আলোয় ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর (ভবাপাগলার) সাধনসঙ্গীত : বিষয় ও শিল্পরূপ

অরূপকুমার ভট্টাচার্য্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

*Bhabendra mohoman choudhuri (1900-1984),commoly known as Bhaba Pagla amongst his millions of devotees and sacred group of *poet hermit of Bengal spreads the sense for social equality going beyond the barrier of morality through mixing his sense of amoral i.e. love and *spirituality. In doing this song was his main weapon that he did to praise his "Maa Kali" sometime as his daughter and sometime as his heavenly mother. He divided his musical performance into three different phases: Theory of upasaya; Theory of upasaka and Theory of upasanan. In the first "Theory of upasaya", Bhaba worshipped his heavenly mother "Maa Kali" to wipe out all black aspects from our mortal life and hold our life in the releam oh heavenly bliss. In the second "Theory of Upasaka" Bhaba went to relate a sound relationship between him and his devoted mother. All songs of this phase describe that since his childhood days be indulged himself to compose song hot only with a great belief of *ideology but with the belief of *humanity. He left his *material life to plumge into the sea of unbounded love for "Maa Kali". And in the last phase of his musical performance i.e. "Theory of Upasana", Bhaba reflected the highest principles of his devotion. He fertilized the kind of Bengali *Folk song culture with his humanism and spirituality.*

Keywords: Poet Hermit; Spirituality; Ideology; Humanity; Material Life; Folk.

বঙ্গভূমিতে যুগে যুগে আগত নামের ফেরিওয়ালা স্রোতধারা বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে আমরা পাই এক অদ্ভূত বিস্ময়কর কবি সাধক ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীকে। এই প্রচার বিমুখ কবি ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী জন্ম ১৯৩০ খ্রিঃ ৩১ শে আশ্বিন (মতান্তরে ১৯৩২ খ্রিঃ) ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার আমতা নামক গ্রামের সাহা চৌধুরী নামক সুখ্যাত ধনী পরিবারে। পিতা গজেন্দ্রমোহন, মাতা গয়াসুন্দরী দেবী। ক্লাস সেভেন-এ উঠে স্কুল জীবন সমাপ্ত করে বালক ভবেন্দ্রমোহন নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে মাতৃ আরাধনা ও সংগীতে সাধনায় ডুবিয়েদেন। ফলে এই বয়স থেকেই (১২/১৩ বছর) তিনি ভবেন্দ্রমোহন থেকে 'ভবাপাগলা' নামে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

শাক্তসাধক কবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের মত ভবেন্দ্রমোহনও সংসারী হন। তাঁর স্ত্রীর নাম শৈবলিনীদেবী, দুই পুত্র সনৎ, সংকল্প ও এক মেয়ে প্রতিমা। ভারত ভাগের পর অবশেষে ১৯৫০ খ্রিঃ তিনি সপরিবারে নিজ জন্মভিটা ত্যাগ করে প্রথমে মুর্শিদাবাদে কিছু দিন থাকার পর কলকাতা হয়ে অবশেষে বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় এসে স্থায়ী ভাবে 'মা'র মন্দির নির্মাণ করেন; যা 'ভবার ভবানী মন্দির' নামে পরিচিতি। আজীবন সেখানেই কাটানোর পর

১৯৮৪ খ্রিঃ ১৩ই ফাল্গুন রবিবারে কলকাতায় আর. জি. কর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁরই ইচ্ছায় কালনা মন্দিরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়; যা আজো সুন্দর ভাবে রক্ষিত আছে।

ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর 'পরিচয়', 'গান'- বুঝতে হলে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথায়ই তা বুঝতে হবে। যার তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন, যারা কাছে বসে নানান সময়ে তাঁর অমৃত বাণী শুনেছেন তাঁর অবশ্যই ঐ শ্রীমুখের বাণী শুনেছেন। তিনি বলেতেন-

"ভবানী এই ভবাকে যা, কয়ে দেয় কানে,
প্রকাশ করে ভক্ত পাশে, রাখিনা গোপনে।"[১]

আরও বলতেন-

"যেমন দেখি, তেমনি লিখি।
যেমন শুনি, তেমনি গাই।"[২]

অর্থ এই যে, সাদা কাগজের বুকে কালো কালিতে ভবেন্দ্রমোহনের কলমে লিপি বদ্ধ গানে গানে দেব-দেবীররে নানা রূপ লাবন্য, নানা ভাব-ভঙ্গিমা, নানা সাজ সজ্জার যে বর্ণনা ফুটে উঠেছে, সে সবই তাঁর দেখে দেখে লেখা। আর প্রতিটি গানে যে মধুর তত্ত্ব অমৃত বাণীতে অমৃত লোকের যে সরলতম পথ নির্দেশ ,মানবিক যেকোন সমস্যার, যে কোন প্রশ্নের সহজতম যে সমাধান প্রকাশিত হয়েছে, সে সকলই ভবেন্দ্রমোহনের গানের পিছনে মহামায়ার মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত সিদ্ধ বাণী।

ভবেন্দ্রমোহনের জীবনী ও সাহিত্যের পর্যালোচনার মূল আকর্ষণ তাঁর রচিত গান। তিনি আজীবন মাতৃ সাধনায় সদা সর্বদা নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। তাঁর এই মাতৃসাধনার যাবতীয় কর্মকাণ্ড ব্যক্ত হতো স্বহস্তে লিখিত গানের মধ্য দিয়ে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একথা আমাদের অবাক করে যে একজন ব্যক্তির পক্ষে শত সহস্র গান রচনা। গানের পরিসংখ্যান বিচার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ধারে কাছে বলে এই যাবৎ জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য কিছুটা হলেও আমাদের মনে পড়ে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের কথা। যদিও রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা সাকুল্যে হয়তো হাজার তিনেক এর বেশি হবে না। নজরুলের প্রায় চার হাজার; যেখানে ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীরভবানী মন্দিরে কালনায় (নিজ বাস গৃহ) প্রায় পনেরোটি গানের খাতায় লিখিত গানের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। যা আজও সযত্নে রক্ষিত।

রামপ্রসাদ থেকে কমলাকান্ত, নজরুল হয়ে ভবেন্দ্রমোহন এই তিনশতকে শাক্তপদ সাহিত্য প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের মিলিত এক মিশ্রিত সাহিত্য ধারা। যেখানে বিষয় ঐক্যে এতগুলি কবিকে একত্রে গাঁথা হলেও ভক্তির দিক থেকে সকলেই সমপর্যায়ের নন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, ভবেন্দ্রমোহন এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেব সাধক কবি, ভক্তিবাদী। সংগীত রচনা ছিল তাঁদের বিশ্বাস ও তর্পণের নামান্তর। গান দিয়েই তাঁরা মূর্তি উপাসনা করছেন। সুরই তাদের মন্ত্র। ভবেন্দ্রমোহনের কথায় বলতে হয়-

"গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা
লাগেনা ফুল চন্দন
মন্ত্র-তন্ত্র লাগেনা।"[৩]

প্রসঙ্গত বলে রাখি ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর রচিত সমস্ত গানকেই তিনি 'সাধন সঙ্গীত' বলে উল্লেখ করেছেন। তবু একথা বলতেই হয় গানগুলির আপন স্বভাব বৈশিষ্ট্যে একতা বড় অংশই শাক্ত পদাবলীর 'শ্যামা সঙ্গীত' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; এবং আর একটা বড় অংশ ' বাউল সঙ্গীত'-এর অন্তর্ভুক্ত। আমদের আলোচনার বিষয় ভবেন্দ্রমোহনের শাক্ত পদাবলীর 'শ্যামা সঙ্গীত' পর্যায়ের গান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যার সূচনা, বিকাশ, বিস্তৃতি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যার ঢেউয়ে গোটা বাঙালী সমাজ প্লাবিত এবং বিংশ শতাব্দীতেও সেই ঢেউয়ের স্রোতধারা আছড়ে পড়েছিল ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর লেখনী স্পর্শে। এখানে লক্ষণীয় যে, এই শাক্তগীতি গুলোর মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতার অস্ফুট উন্মেষ ঘটেছিল। কেননা, উনিশ শতকে এমন অনেক শাক্তকর্তারা আছেন যাঁরা অনেক শাক্ত উপাসক ছিলেন না, অথচ শাক্তপদের মতো অন্যপদও রচনা কেরেছেন। আবার বিংশ শতকে ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী মাতৃসাধক ও কবি- এই দুয়ের মিলবন্ধন ঘটিয়ে অষ্টাদশ শতকের কবিবর রামপ্রসাদে সেনের ধারাকে অনেকটা মরা গাঙে নতুন করে বান ডাকার মতো তুলে ধরেছেন।

ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর বিপুল সঙ্গীত ভাণ্ডারকে বিষয় অনুযায়ী ভাগ ও বিশ্লেষণ করাটা অনেকটা রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অসংখ্য তারাকে ভাগ করার মত কাজ। তবুও একথা মাথায় রেখে ভবেন্দ্রমোহনের সাধন সঙ্গীত আলোচনার অগ্রবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণি বিন্যাসের সাহায্য নিতেই হয়।

শ্রদ্ধেয় জাহ্নবী চক্রবর্তী ও শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়গনের মতামত গুলিকে সমানে রেখে একথা বলতে পারি যে শক্তি তত্ত্ব শাক্তপদাবলীর রূপ রস বিচার প্রথাগত ধারায় উপযুক্ত শব্দের অভাবেরই হয়ত এত কাল শাক্তপদ আলোচনায় 'মা' কী ও কেমন, জগজ্জননীর রূপ বা এই জাতীয় পর্যায় বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে নানান ভাগ ও উপবিভাগ ছাড়িয়ে পড়েছে। যেমন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে কীর্তনীয়াগণ তাঁদের কীর্তনের প্রয়োজনে রাধা কৃষ্ণের জীবন ও ঘটনা ক্রমকে বাল্যলীলা থেকে শুরু করে বৃন্দাবন লীলা এরকম নানান পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছিলেন শ্রোতা, ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ও সুবিধার্থে। কিন্তু শাক্তপদ বিশেষত উমা সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত কীর্তনীয়াদের মতো কোনো সম্প্রদায়ের হাতে আসার জমানোর উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেনি। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার শাক্তপদ বিশেষত শ্যামাসঙ্গীত সম্পূর্ণ রূপে ভক্তি প্রকাশক। এখানে ভক্তির সর্বস্বতায় অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই শাক্ত পদের মূল জায়গাই হলো ভক্ত ভগবান। ফলে ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর গাব গুলির শ্রেণি বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর লেখনীর যাবতীয় পদ শ্যামাসঙ্গীত নির্ভর। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের মতো উমাসঙ্গীত বিষয়ক কোনো গান ভবেন্দ্রমোহনের নেই। তাই 'শ্যামা সঙ্গীত' বিষয়ক গান গুলির মূলত তিনটি দিককে গ্রহণ করে আলোচনার অগ্রসর হতে পারি। প্রথমটি উপাস্য, দ্বিতীয়টি উপাসক এবং তৃতীয়টি উপাসনা। শাক্ত কবি হয় তাঁর উপাস্য দেবতা অর্থাৎ শ্যামা জননীর বিশ্বময়ী মহাকাল কামিনীআদিভূতা সনাতনীর মহিমা কীর্তন করেছেন। কখনো সেই উপাস্য জননীর কাছে উপাসক ভক্তের প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। আর এই বিষয় ছাড়া অন্য এক ধরনের পদে ভক্ত তাঁর উপাসনার পদ্ধতি, প্রকরণ, উপায়, পন্থা ইত্যাদি ব্যক্ত করেছেন। আবার কোন কোন পদে এই তিনটি পর্যায় মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও ভাবের বশে আত্মমগ্ন কবি বিশ্বজননীর মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে উপাসনাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই এই বিষয় গুলিকে সামনে রেখে শাক্ত পদধারার ক্রম পর্যায়ে ভবেন্দ্রমোহনের শ্যামা সঙ্গীত বিষয়ক শাক্ত পদের একটি শ্রেণিকে উপাস্য সঙ্গীত বা মাতৃমহিমা সঙ্গীত, দ্বিতীয়টি উপাসক সঙ্গীত এবং অপরটি সাধন সঙ্গীত বা উপাসনা সঙ্গীত রূপে বিন্যাস করে আলোচনায় অগ্রসর হব।

উপাস্য তত্ত্ব :

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রানে
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানের মথ্য দিয়ে পরম উপাস্যকে সর্বদা সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে নব নব পাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। ঠিক তেমনি শাক্ত সাধনকের কাছে একমাত্র চরম ও পরম আরধ্য উপাস্য হলেন শক্তিদেবী প্রয়োজন হিসাবে সাধকের আরাধনার ক্ষেত্রে, গুন ও ক্রিয়া অনুসারে নানান সময়ে ভিন্ন ভিনগন রূপে পরিগ্রহ করেছেন। শক্তিদেবী কালিকার রূপ বিভিন্ন তন্ত্র ও পুরণাদিতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মচিন্ময়, অদ্বিতীয়, অসংরহিত এবং অশরীর; তা সত্ত্বেও উপাসকদের কল্যানের জন্য তিনি রূপপরিগ্রহ করেন। তন্ত্র সাধনার প্রাধান লক্ষ্য হচ্ছে এই শরীর রূপকে আশ্রয় করে, অরূপ ব্রহ্মে পৌঁছানো, মূর্তিকে অবলম্বন করেই ব্রহ্মের

সাজুয্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। দেবী মূর্তি এই মূর্তিকে অবলম্বন করার উদ্দেশ্যেই গঠিত। এই দেবীমূর্তি একদিকে সংহার রূপিনী, অন্যদিকে বরাভয় দায়িনী। দেবী ভাগবৎ এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখতে পাওয়া যায় দেবী বিপদগ্রস্থ দেবতাদের সহায় হন, বিভিন্ন অসূরকে সংহার করেন। মহানির্বাণ তন্ত্রে দেবীকে নিখিল ভূবনের জননী বলা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন দেবী ভগবতী, কালী, তারিণী,দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবর্তী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা অর্থাৎ মোট দশ মহাবিদ্যা রূপেনিজেকে প্রকাশ করেছেন।

বাংলার শক্তি সাধকগণ দেবীকে সাধনা করেছেন কালী মূর্তিতেই। সুতরাং তন্ত্র শাস্ত্রে কালী মূর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে 'জগজ্জননীর রুপ' পর্যায় 'মা কিও কেমন', 'ইচ্ছাময়ী মা', লীলাময়ী মা', 'কালভয়হারিনী মা', 'করুনাময়ী মা', 'ব্রহ্মময়ী মা', প্রভৃতি নামে নামাঙ্কিত করে দেবীর সেই মূর্তিকেই বিভন্ন ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়াও ভবেন্দ্রমোহন 'মা'কে 'সর্ব্বজননী মা' 'দুখহরা মা', 'ভবদারা মা', 'হরবোল মা', 'আনন্দময়ী মা', 'ভবানী মা', নামে নামাঙ্কিত করে বিশেষায়িত করে। নিজ দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

দেবীর এই মূর্তিই 'জগজ্জননীর রূপ' অর্থাৎ উপাস্য তত্ত্বের বিভিন্ন পদে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্যায়ে ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর কিছু গান উদ্ধৃত করলেই এই পর্যায়ের গানগুলির প্রকৃতি বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার শাক্ত পদকর্তারা তাঁদের উপাস্য দেবীকে কখনও ধ্যানে কখনও সংসার জীবনের নানান দৈনন্দিন জটিলতার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছেন। তাঁরা বাইরে দেখেছেন মৃৎশিল্পীর গড়া মৃৎ প্রতিমা বা প্রস্তর শিল্পী গঠিত মর্মর মূর্তি। তাই তাঁদের বর্ণনা শুধু রূপগ্রাহ্য, নয়ন রঞ্জন। তবে দেবতার অলৌকিক রূপে যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অতিক্রম করে যায়, সে সত্যও তাঁদের উপলব্ধি হয়। যেমন ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর মাতৃ সাধনার আদি রূপ মা কালীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন–

"মাকে দেখে দেখে (তাঁর) ছবি এঁকেছি
রঙ নয়,, তুলি নয়,, মনের মাঝে মাকে আমার তুলি রেখেছি।
চোখে ছিল এক ফোটা জল,,
ফুটে ছিল হৃদয় কমল।
মায়ের দু'টী চরণ কমল,,
কমল দিয়ে কমল পূজেছি।।
যত দেখি মাকে আমার,,
অফুরন্ত এ আবিষ্কার।"[৫] *(গান নং- ৩৬৪)*

অর্থাৎ এখানে খুব পরিষ্কার ভাবেই ভবেন্দ্রমোহন জানিয়ে দিয়েছেন যে মায়ের নানান রূপের কথা যে তিনি বলেছেন, তা তাঁর সবই প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার কথা। এখানে মা'র 'চোখ', 'হৃদয়', 'চরণ', - সমস্ত কিছুর বর্ণনা করেছেন। কবির হৃদয়ে 'মা'র যে ছবি আঁকা তা 'রঙ' তুলি দিয়ে কোন কৃত্রিম ছবি নয়। তিনি হৃদয়ের সর্বস্বতা দিয়ে মাকে মনের মাঝে তুলে রেখেছেন। তবুও যতই মাকে দেখেন তবু 'মা'র রূপের কোন শেষ নেই বলেই তো বললেন- "অফুরন্ত এ আবিষ্কার"।

ভবেন্দ্রমোহনের মাতৃরূপে আবিষ্কার 'মা'-র রূপ বর্ণনায় 'তুই', 'তুমির' সম্বোধন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে–

"লোল জিহ্বা তোমার, করিয়া বিস্তার,,
নাশিলে, নাশিলে মা গো,, তোমারি এ সংসার।
ভীষণ খড়গ লয়ে আবার,, চলিস ধেয়ে,
সঙ্গে রঙ্গে চলে ডাকিনী যোগিনী।।

গলে দিয়ে মুণ্ড রাশি,, হাসিয়া অট্টহাসি,,
তাথৈ তাথৈ রবে,, কি করিস তুই সর্ব্বনাশী।"[৬] *(গান নং- ৪৫৫)*

এখানে 'মা'র ভয়ঙ্কার রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি সাধক ভবেন্দ্রমোহন এক রূঢ় বাস্তব জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। এই গানে ব্যবহৃত 'সর্ব্বনাশী' শব্দটি লক্ষনীয় ও বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। 'মা' কে এখানে 'সর্ব্বনাশী' বলে সম্বোধন করেছেন কবি। অর্থাৎ 'মা' জগতের সমস্ত পাপের বিনাশ করেন বলে তিনি 'সর্ব্বনাশী'। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে, ভবেন্দ্রমোহন তাঁর জীবৎকালে দেখেছেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানান পটপরিবর্তন। যেমন- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর জন্ম। তিনি দেখেছেন দু-দুটি মর্মান্তিক বিশ্বযুদ্ধ, দেখেছেন অখণ্ড ভারতবর্ষ, স্বাধীন বাংলাদেশ। এইসবসব নানান বৈচিত্র্যময় ঘটনাগুলির দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন ভবেন্দ্রমোহনের জীবন সাক্ষী হয়ে রয়েছে সামাজিক অস্থিরতা ও জটিলতাপূর্ণ এক জীবন চিত্র। যে জীবন চিত্র থেকে সর্বপাপের বিনাশ সাধন করে মানুষকে মুক্তিপথগামী করে তোলার জন্যই 'মা' কে 'সর্ব্বনাশী' এই সম্বোধনে তিনি ডেকেছেন। এরকম অপর একটি গানে অসুর বিনাশী দানব দলনী মা কালীর রূপ তুলে ধরে বলেছেন-

"হুকারে নাচে কালী,, অসি ধরিয়া হাতে।
মুকুটের ঝলমল,, জ্বলিতেছে গগনেতে।।
খিয়া খিয়া নাচে কালী,, অসুর দিয়া বলি,, [৭] *(গান নং- ৪০৯)*

এখানে কবি দৃষ্টিতে মা রণঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করেছেন। তাই মা অসি ধরে রণহুঙ্কারে অসুর নিধনে মেতে গরবে নেচে নেচে উঠেছেন। মা-র এই রূপ চিত্রকে 'লীলা' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত দেখতে পাওয়া যায় প্রায় এই একি রূপচিত্র অর্থাৎ মায়ের নগ্ন থাকা ও সেই বেশে শত্র নিধন, মহাকাল বক্ষে অবস্থান ও নৃত্য করা প্রভৃতি চুত্রকে রামপ্রসাদ 'লীলা' বলে উল্লেখ করে গেয়েছেন। -

"ন্যংটা বেশে শত্রনাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন সে'বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা সকলই জেনো ডাকাতি।"[৮]

সমাজের দাবি মেনে 'মা' কে যেমন 'সর্ব্বনাশী' রূপ ধারণ করতে হয়েছে তেমনি কখনো কখনো মানুষের দুঃখ হরণ করার জন্য তাঁকে হতে হয়েছে 'দুখহরা'। তাই কবি বলেছেন-

"দুঃখ হরণ করিস বলে, নাম তব মা, দুখহরা।
অত দুঃখ মোর কপালে,, ঘুচালি না তুই মাতারা।"[৯] *(গান নং- ৪৮৬)*

মা 'দুখহরা' হয়ে সবার দুঃখ হরণ করে অথচ ভবেন্দ্রমোহনের কপালে কত দুঃখ আছে সেগুলি মা ঘুচাল না বলে 'মা'র কাছে নিজ মনের ক্ষেদ প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি হাল ছাড়ার পাত্র নন বলেই জানেন যে একমাত্র মা-ই তো আছেন সন্তানের দুঃখ কষ্ট দূর করে চোখের জল মোছাবেন। আবার এই মা-ই সন্তানের দুঃখ হরণ করে তাদের সমস্ত আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করেন বলে তিনি 'রক্ষাকালী'। তাই বলেছেন-

"অত আগুন জ্বালিয়ে দিলি,,
সোন্ বলি মা,
রক্ষাকালী তুই সাজিলি,,
আমাকে মা করতে সারা।।"[১০] *(গান নং- ৪৮৬)*

অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষকে উদ্ধারের জন্যই মা তারা কখনো 'দুখহরা', কখনো 'রক্ষাকালী', আবার কখনো 'শ্মাশানকালী' রূপ ধারণ করেছেন।

শাক্ত কবিরা নিজেদের অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে কালী মায়ের প্রকৃত রূপ দেখতে পেয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন শক্তিরূপা দেবীই এক সময় প্রেমের মহিমাময় রূপে প্রকাশ করার জন্য অপ্রাকৃত লীলা করেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই অসীম শূন্য। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের দেশে শক্তি সাধনা এবং বৈষ্ণব সাধনা, শাক্ত সাধক ও বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে এক অভেদ তত্ত্ব এবং সমন্বয়ের সুর শুনিয়েছেন শক্তি সাধকরা এই পর্যায়ে। আসলে এই মানসিকতা আধুনিক যুগের প্রাক্কালে জাগ্রত এক সংস্কারমুক্ত ধারণা। এই ধারনার প্রকাশ আমরা সমকালীন কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও দেখি। ব্যাসের আখ্যান এবং হরিহোড়ের আখ্যানে এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে হরি এবং হর অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে মোন পার্থক্য নেই। ব্যাসকে স্বয়ং বিষ্ণু এসে বুঝিয়েছেন। -

"যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব।"[১১]

শাক্তপদের এই পর্যায়ে কবিদের এই অভেদতত্ত্ব এবং সমন্বয়ের সুরই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর একটি গানে বলেছেন-

"মা,, তুমি ধর বাঁশী,, (আর) কৃষ্ণ ধরুক অসি,,
দেখবো আমি,, কেমন লাগে,, থেকে পাশাপাশি।
এ যে মধুর তত্ত্ব,, ভাবের তত্ত্ব,, তাই তো পরাণ ভরে হাসি।

যে, যা বলুক,, ভাল মন্দ, দ্বন্দ্ব সমান,,
অভিন্ন এ ভাবর মূর্তি,, ভক্ত যেমন সাজান।
কালীর অসি,, কৃষ্ণের বাঁশী,,
বজ্রবাসী (আর) শ্মাশানবাসী।"[১২] *(গান নং- ৪০২)*

এখানে কবি কালী কৃষ্ণকে পরিবর্তন করে কালীর হাতে বাঁশী আর কৃষ্ণের হাতে অসি ধরিয়ে পাশাপাশি অবস্থান ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ কালী যে ভেদ নয় উভয়য়েই এক অভেদ তত্ত্ব সে কথায় বলতে, বোঝাতে চেয়েছেন। যদিও কবি জানেন যে তাঁর এই মত ও রূপকে অনেকে মানবে না বা সমালোচনা করবে। যদিও তিনি সমালোচনার ভালো মন্দ উভয় মতকেই গ্রহণ করে ঈশ্বর রূপের এই অভেদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন ভক্ত আপন মন ও বিশ্বাস নিয়ে নিজে ঈশ্বরকে যে ভাবে সাজান সে ভাবেই ঈশ্বর সাজেন।

শুধু কালী কৃষ্ণকে নিয়েই নয়, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম এঁদের সকলকে এক আসনে বসিয়ে আভেদ তত্ত্বের এক চূড়ান্ত রূপ গেঁথে ভবেন্দ্রমোহন অপর একটি গানে বলেছেন-

"কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ভিন্ন কভু নয় রে এঁরা।
মনের বিকার, সব একাকার, বোঝেনা, যারা,আঁখিহারা।"[১৩] *(গান নং- ২৯৬)*

ভেদ বা অভেদ এর মূলেই রয়েছে মানুষের মন। মনের বিশ্বাসই পারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে। তাই মনের ভুল ভেঙে প্রকৃত জ্ঞান চক্ষুর আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে পারলেই দূর হবে অন্ধকার, পাওয়া যাবে প্রকৃত পথ ও মত। যে পথ ও মত মানুষকে দিতে পারে সঠিক জীবনের ঠিকানা। আর মানুষ মাত্রই তো চায় জীবনে চলার সঠিক পথ। যে পথ তার জীবনকে করে তুলবে সহজ, সহজ, সুন্দর। কারণ প্রতিটি সুস্থ স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধি

সম্পন্ন মানুষই সুন্দরের পূজারী। আর মানুষকে এই পথগামী করে তুলতে মাকে কখনো কালী রূপ ধারণ করতে হয়েছে, তো কখনো আবার কৃষ্ণরূপ ধারণ করতে হয়েছে। তাই কবি বলেছেন–

"তুমি ভাব কালী,, তিনি বনমালী,,
কভু ধরে বাঁশী,, কভু ধরে খাঁড়া।"[১৪] *(গান নং– ২৯৬)*

ঈশ্বররূপে এই অভেদতত্ত্ব অনুধাবন করতে হলে কোন যুক্তি, বুদ্ধি বা তর্ক দ্বারা তা লাভ করা যাবে না। কারণ সমস্ত যুক্তি, বুদ্ধি, তর্কের উর্দ্ধে তিনি। তাঁকে অন্তরে পেতে হলে, বুঝতে হবে, জানতে হলে প্রয়োজন দিনরাত্রি দাস ভাবে তাঁ জপ করতে হবে বলে ভবেন্দ্রমোহন আমাদের জানালেন–

"নিগূঢ় তত্ত্ব, বুঝিয়া অন্তরে,,
দিবানিশি, মন, তুমি জপ রে।
যুক্তি, বুদ্ধি, তর্কে ধরিতে না পারে,,
পারে সেই জন,, দাস হয় যারা।।"[১৫] *(গান নং– ২৯৬)*

আরাধ্য দেবী কালীর বিভিন্ন রূপের মধ্য একটি বিশেষ রূপ তিনি করুণাময়ী মা। আমরা জানি আমাদেরই প্রয়োজনে দেবী কালিকা শক্তিরূপিনী মা যেমন ধ্বংস করেন, তেমনি বরাভয় দান করে তাঁর কল্যানমূর্তিও প্রকাশ করেন। দেবীর এই malignant মূর্তির পরিবর্তে beneficial বা করুণামূর্তির পরিচয়ই আমরা 'উপাস্যতত্ত্ব' পর্যায়ে পাই। তাই কবি ভবেন্দ্রমোহন একটি গানে বলেছেন–

"সকল ই তোমার ইচ্ছা,, ইচ্ছাময়ী মা।
পূর্ণ কর স্ব-বাসনা,, ব্রহ্মময়ী শ্যামা।।"[১৬] *(গান নং– ৩৮৫)*

প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, প্রতীয়মান; আর সব কিছুই মিথ্যা। কিন্তু এই যে জগৎ সংসার, আত্মীয় পরিজন, যার মায়ায় আমরা জড়িয়ে আছি, তাদের একান্তজন ভাবা, এই সবই ব্রহ্মশক্তির লীলার কারণে ঘটে থাকে। তাই মা কালী কীভাবে আমাদের মধ্যে এই ভ্রম সৃষ্টি করে আমাদের সংসার চক্রে ঘুরিয়ে মারছেন, যার চিত্র শাক্ত সাহিত্যের বিভিন্ন পদকর্তাগণ তুলে ধরেছেন; যার ব্যতিক্রম নন ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীও। তাঁর উপাস্য তত্ত্ব পর্যায়ে ব্রহ্মময়ী মাকে নিয়ে রচিত গানে বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম নির্গুন, নির্বিশেষ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবাঙ্মানসগোচর, আবার লীলার কারণে তিনিই আনন্দময় ও লীলাময়। শক্তি সাধকগণ মায়ের সগুন ও সবিশেষ রূপের আরতিই করেন, কিন্তু মায়ের ব্রহ্ম স্বরূপ মূর্তিও ধ্যানের নেত্রে তাঁদের কাছে ধরা পড়ে। এই অবস্থায় কালীই ব্রহ্ম, তিনিই 'ব্রহ্মময়ী মা'। তখন তিনি রূপহীন, নামহীন, নিষ্ক্রিয়; সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের অধিকর্ত্রী হয়েও তিনি তখন নির্গুন। মায়ের এই তত্ত্ব স্থুলবুদ্ধির অগম্য।

বৈষ্ণব পদে পঞ্চভাবের এক পরম ভাব হল 'সেবা'। এই সেবা ভাবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভক্তের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক। যেখানে ভক্ত সম্পূর্ণ রূপে রাথা কৃষ্ণের নীরব সেবায় থাকে মগ্ন। এখানে ভক্তের সাধনাকে বলা হয় মঞ্জরী ভাবের সাধনা। ভক্ত নিজেকে রাধা-কৃষ্ণ লীলার সহায়তক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শাক্ত সঙ্গীত উপাসক, সেবক বা ভক্তকে নিয়ে সেভাবে কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠত হয়নি। কেননা, শক্তি সাধনায় ভক্ত স্বয়ং উপাসক। উপাস্য বিশ্বজননীর সঙ্গে তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। তিনি ভক্তের আপন জননী। তাই ভক্ত ও জননীর মধ্যে স্নেহ, বাৎসল্য, আদর আবদারের সম্বন্ধ। ভক্ত ভগবানের এই নীরবে নিভৃত আলাপ-চারিতার গীতিময় ধারাটির সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার যেমন রামপ্রসাদ, ঠিক তেমনি সৃষ্টির এই ধারাটিকে বিংশ শতাব্দীর কবি ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী যিনি লোকসমাজে ভবাপাগলা নামেই অধিক পরিচিত, তাঁরই অসংখ্য গানে আমরা বিচিত্র সুর শুনতে পাই।

মানুষ মাত্রই সমাজ বদ্ধ জীব। তাই প্রতিটি মানুষের জন্ম, লালন, পালন, শিক্ষা, দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বেড়ে ওঠা সবই মায়ের কোল আশ্রয় করে; তেমনি কবিও এখানে ভক্তোপাসক। মাতৃ চরণেই তারঁ প্রণাম নিবেদন চলে কখনো জীবনের ব্যর্থতায় হতাশ-নৈরাশ্য প্রকাশ করেন, কখনো শ্রদ্ধা ভক্তির প্রার্থনা করেন, কখনো মাতৃ চরণে লীন হওয়ার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেন, কখনো এই জননীকে স্বচক্ষে দেখতে না পাওয়া, কখনো বা জননীর কোলে আশ্রয় না পাওয়া আবার কখনো বা জননীকে কাছে পেয়ে পুণরায় হারাবার ক্ষেদ, ভয় বা হতাশা প্রকাশ করেন।

বৈরাগ্য শাক্তে ধর্ম না হলেও জীবনের প্রতি বৈরাগ্য এই শাক্ত পদাবলীর একটি পরিচিতি বিষয়। কেননা কবিরা যেহেতু প্রায় সকলেই বিষয়ী, ভোগী, আসক্ত ও সংসারী তাই তাঁদের এই বৈরাগ্য যতটা অকপট ঠিক তেমনি প্রচলিত ধারনার বশবর্তী। তাঁরা প্রায় সকললেই সংসারী, গৃহী, বিষয়াসক্ত ছিলেন। তবুও এসবের ঊর্দ্ধে উঠে তাঁরা চূড়ান্ত ভক্তির আবেগে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বিলীন হওয়ার ইচ্ছার কামনা প্রকাশ করেছেন। দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতায় সংসারের জ্বালা- যন্ত্রণা রিপুর তাড়না, পঞ্চভূতের প্রকোপ,আধি ব্যাধির অত্যাচার, সংসারের অভাব- অভিযোগ এসবের কথা সরাসরি মায়ের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন। আর এই বিষয়গুলি ভবেন্দ্রমোহনের গানে আমরা পাই।

অবাক হলে ও সত্যি যে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর সঙ্গীত সাধন শুরু। যার নিদর্শনি স্বরূপ তাঁর রচিত প্রথম গান বলে পরিচিত–

"এসো মা কালী,, শুন মা বলি,,
আমার প্রাণের বেদনা।
লাগেনা ভালো কি যে করি,,
তুমি আমায় বল না।"[১৭]

বালক কবি মায়ের কাছে নিজ প্রাণের যাবতীয় বেদনা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। মাকে কাছে পেয়ে তার যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলে সেখান থেকে কি করে বেরিয়ে আসবে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই গানেরই পরবর্তী স্তরে বলছেন–

"তুমি বিনে আর কেউ নেই আমার,,
দগ্ধ হৃদয়ে দিতে শান্ত্বনা।।"[১৮]

এখানে মা সর্বস্ব জীবনের কথা বলেছেন। তাই হৃদয়ের যাবতীয় দুঃখ,জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র শান্ত্বনা যে মা সেকথাই ফুটে উঠেছে। তাই তো দুঃখ ভরা জীবন নিয়ে কবির জীবনে চাওয়া পাওয়া, ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে গানটির শেষাংশে–

"শেষের দিন ভাবার এলো কাছে,,
আর কেন মা, র ইলি পিছে।
এস এস মা, জ্বলন্ত প্রতিমা,,
আর দূরে (তুমি) থেকো না থেকো না।"[১৯]

নিতান্তই বালক বয়সে মুখে মুখে গান রচনার মধ্য দিয়ে মাতৃ আরাধনা চললেও এই বয়সেই বালক কবি ভবেন্দ্রমোহন তাঁর আগামী জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটার এক আশ্চার্য ইঙ্গিত দিয়েছেন এই গানে। কেননা আমরা জানি ১২/১৩ বছর বয়সেই বালক ভবেন্দ্রমোহন মাতৃ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে গাব গাছের ডালে ঝুলে পড়েন। যদিও সে যাত্রায় 'মা' এর পাগল ছেলে বেঁচে যায়। হয়ত মা ছেলের মধ্যে মান

অভিমানের পালায় ছেলের মা কে পরীক্ষার এক আশ্চার্য চিত্র এই ঘটনা। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তমোনাশ বাবু লিখেছেন–

> *"কাল বিলম্ব না করে তিনি উঠে পড়লেন ঐ গাছে। কাছে গতয়ে রজ্জুটার শক্তি পরীক্ষা করলেন টান মেরে। স্থির করে ফেললেন, ঐ রজ্জু দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন উদ্বন্ধনে। যথা চিন্তা তথা কাজ। দড়িতে ফাঁস লাঘিয়ে আপন হাতে গলায় পড়িয়ে মায়ের পাগল ছেলে পা-দুখানি গাছথেকে আলগা করে ঝুলিয়ে দিলেন নিচের দিকে। যথারীতি তাঁর তিনবার কালী কালী কালী নাম ও উচ্চারণ করলেন বুঝি অস্ফুটস্বরে। ব্যস তার পর আর স্মরণ নেই কিছু।"*[২০]

একাক্ষর শব্দ 'মা'। এই 'মা' সম্বোধনে সমগ্র বাঙালি জাতি মাতৃনাম বিগলিত প্রাণ জাতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই আপামর বিশ্ব বাঙালির পক্ষ থেকেই মাতৃ সাধক কবির জিজ্ঞাস্য–

"কে তোমারে ডাকিল প্রধম 'মা'বলিয়া,,
তুমি কি শিখায়েছ মা, মধুর বুলি।
ভাবিতে জনম গেল,, মা গো,, আমার,,
তাই ডাকি আমি কালী কালী।।"[২১] *(গান নং- ৪৮৯-ক)*

গানের মধ্যেই তিনি 'মা' এর কাছেই জানতে চেয়েছেন যে কে তাঁকে প্রথম 'মা' বলে ডেকেছে। যে ডাক এত মধুর, মিষ্টি; যেডাক সমস্ত ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যায়, দূর হয়ে যায় সকল ক্ষুধা তৃষ্ণা 'দলাদলি'। এখানে লক্ষনীয় 'দলাদলি' এই শব্দের মাধ্যমে দিয়ে তিনি 'মা' ডাকের মধ্য দিয়ে বিভেদ বৈষম্য কে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ধারনা বিশ্বাসকে তুলে ধরতে চেয়ে বললেন–

"কে সৃজিলো, ওগো এমন কথা,,
কোন সাগর হতে উঠলো সুধা
দূরে সরে যায় ঐ সকল ব্যথা,,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা,, ভুলে যায় দলাদলি।"[২২] *(গান নং- ৪৮৯)*

এই 'মাতৃনাম'-এর স্নেহের পবিত্র ভাণ্ডার থেকে নাম রস, সুধা পান করেই সংসার ধর্ম করা, যেখানে সেখানে হাসি মুখে চলা ফেরা করার অধিকার পান বলেই তাঁর বিশ্বাস। তাই তো 'মা' এর উদ্দেশ্যে বলেন–

"তুমি কি সেই স্নেহের পবিত্র ভাণ্ডার,,
ভবাপাগলা গেয়ে যায়,, করিয়া সংসার।
তুমি তো দিয়েছ,, মা যত অধিকার,,
তাই, হাসি মুখে,, সে সাহসে,, যথা তথা চলি।।"[২৩] *(গান নং- ৪৮৯)*

অফুরন্ত স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, আবদারের ভাণ্ডার হল 'মা'। এই 'মা'–এর কাছেই সন্তানের কামনা বাসনা, প্রেম, আদর আবদারের যাবতীয় চাওয়া পাওয়া। তাই 'মা' এর অধিক প্রেম, স্নেহ, আদরে সন্তান যে বিপথে চলে যায়; শুধু তাই নয়, মায়ের এই অধিক স্নেহ আদরে স্বয়ং ভবেন্দ্রমোহন নিজেই বিপথগামী হয়ে 'মা' এর কাছে আক্ষেপ করেছেন–

"(মা গো) অত আদর,, অত স্নেহ সব করিলি মাটি।
চোখ রাঙ্গিয়ে করলে শাসন,, হ'তাম আমি খাঁটি।।"[২৪] *(গান নং- ৪২৫)*

'মা' এর হাতেই ভাঙ্গা গড়া বলে বেদ-পুরাণে কথিত; যা মিথ্যা কথা নয় বলে জানিয়ে কি করে কোন পথে গেলে নিজেকে খাঁটি রূপে গড়ে তুলতে পারবেন তা জানতে চেয়ে বলেছেন–

"মিথ্যা কথা নয়,,-
ভাঙ্গা গড়া তোর ই হাতে বেদ-পুরাণে কয়।
(আমি) কি করে মা ভাল হব,, কোন পথে মা হাঁটি।।
হ'তাম আমি খাঁটি:"[২৫]

(গান নং- ৪২৫)

সন্তানের জন্ম, লালন পালন যাবতীয় কার্যই 'মা' এর দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাই সন্তান বিপথগামী হয়ে দোষী হলে সেই দোষ যে 'মা' এর উপর বর্তাই সে কথাও জানতে ভোলেননি-

"বুঝি দেখ মা তুই,,-
মায়ের দোষে ছেলে দোষী,, শোন গো ব্রহ্মময়ী।"[২৬] *(গান নং- ৪২৫)*

আবার সন্তানের যাবতীয় পাপের দায় যেমন মা' এর তেমনি সেই থেকে সন্তানকে মুক্ত করার যাবতীয় দায় দায়িত্ব মায়ের বলেই তো 'সর্ব্বনাশী'ল অর্থাৎ সমাজের পাপকে নাশ করেন তিনি। তাই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে মা ছেলের মধ্যে অভাব অভিযোগ নিয়ে এক নতুন পথ উন্মোচন করলেন এই গানেরই একেবারে শেষমেশ-

"(তাই) ভবপাগলা গাল দিয়ে কয়, সর্ব্বনাশি বেটী।
হ'তাম আমি খাঁটি।"[২৭] *(গান নং- ৪২৫)*

প্রসঙ্গত মনে পড়ে কবি নজরুলের কথা তিনি দেশকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। দেশের প্রতি ভালোবাসায় তাঁর কৃত্রিমতা ছিল না। দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরেছিলেন। শুধু নিজে নয়, দেশের অগণিত মানুষকে মাতৃমুক্তি যুদ্ধে সামিল করেছিলেন। দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শোষক ব্রিটিশ সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এদের অন্যায় অত্যাচারের স্বরূপটা তিনিও শাক্তপদে এমন ভাবে আমাদের সমনে তুলে ধরেছিলেন-

"দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখান, আসবি কখন সর্ব্বনাশী?"[২৮] *(গান নং- ৪৮৯)*

অর্থাৎ কবি নজরুল ও দেশকে ইংরেজ অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি করে সব পাপের বিনাশ ঘটিয়ে দেব শিশুদের রক্ষা করার আহ্বান জানাতেই দেবীকে 'সর্ব্বনাশী' বলে সম্বোধন করেছেন।

সন্তান মাত্র ই 'মা'-র চরণে খুঁজে চিরনির্ভরতা, বরাভয়, শান্তি। তাই কোন সন্তানই চাইনা 'মা'-র চরণ ছাড়া হতে। জীবন মৃত্যূ এ যেন মানব জীবনে দু' দিনের জন্যে পৃথিবী বেড়াতে আসার মতো। এই পৃথিবীতে এসে একবার 'মা'- চরণ পেয়ে আর চরণ ছাড়া হতে চান না কবি। তাই 'চরণ ছাড়া' হবার দুঃখ নিয়েই জীবন মৃত্যু ভুলে একেবারে চিরস্থায়ী ভাবে 'মা'-র চরণে আশ্রয় পাবার আশা নিয়ে তাঁর প্রার্থনা-

"আর চাহিনা জনম, আর চাহিনা মরণ''
(শুধু) তোমার চরণ তলে রেখে দাও।
আমি বড়ই দুঃখী, তাই জানিয়ে রাখি,,
আঁখির পলকে প্রভু,, ফিরে চাও।"[২৯] *(গান নং- ১০১)*

'মা'-র চরণ ছাড়া হবার ভয় পেয়ে নিজেকে বড় ই দুঃখী বলে মনে করে 'মা'কে অগ্রিম প্রার্থনা করেন; যে মা যেন অন্তত একটিবার তাঁর দিকে ফিরে চায়। কেননা তিনি মনে করেন জীবনে যা কিছু চাওয়া পাওয়া তা সব ই

'মা'-এর দেওয়া। তাই আজ সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ঊর্দ্ধে উঠে দুদিনের জন্য এই আসা যাওয়ার বন্ধ করে ভুল ভেঙে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বলেন–

"আমার ই চাওয়া, তগাই তোমারি দেওয়া,,
আমার এই নশ্বর দেহে একটু হাওয়া।
তাই দুদিনের তরে এসে,, বেরিয়ে যাওয়া,,
এ ভুল চির তরে ভেঙে দাও।।"[৩০] *(গান নং- ১০১)*

বিংশ শতাব্দীর যুগ যন্ত্রণায় নানান ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হওয়া ভবেন্দ্রমোহন ওরফে ভবাপাগলা নিজেকে গড়েছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা তাঁর ব্যক্তি জীবনে, সংসার জীবন ও সাধনার জগতে এক ভিন্ন মাত্রা এনেছিল। তাই তিনি তাঁর সাধন সঙ্গীতে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, বিধি-বিধান, মত ও পথকে ভেঙে দিয়ে গড়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ রূপে সংসার সমাজ নির্ভর এক আটপৌড়ে স্বাধীন ভাব। যে জগতে পরম করুণাময়ী মাকে একটু দেখা বা পাওয়ার জন্য ইট, কাঠ, পাথরের প্রতিষ্ঠিত কোন দেবালয়ে দেবমূর্তীর প্রয়োজন হয় না বলেই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন–

"বহুজনার মাঝে মাগো,, তোমায় আমি দেখতে পাই।
নইলে কি মা,, অমন করে পাগল হয়ে গান গাই।।"[৩১] *(গান নং- ৩৭২)*

এখানে একটি বিষয় তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে দৈনন্দিন সমাজ জীবনে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মধ্যেই মা মিশে আছেন। এই সবার মাঝে মাকে খুঁজে পাওয়ার, দেখার, স্পর্শ করার জন্য চায় ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকার। পুথি বা কোন দেবালয়, মূর্তি নির্ভর মা নন, এই পথ ও মতই এখানে প্রতিষ্ঠিত। তাই তো বলেছেন–

"মাগো, সবাই তোমার গুনগানে,,
মুগ্ধ হয়ে, ব্যাকুল প্রাণে।
মূর্তি গড়ে মনের কোনে''
নয়ন জলে ভাসে তাই।।"[৩২] *(গান নং- ৩৭২)*

বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বাস সাধনা করে মাকে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন ধ্যান-ধারনা। এই প্রচলিত অর্বাচীন বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে প্রকৃত সাধনার এক যুগান্তকারী পথ দেখালেন কবি সাধক ভবেন্দ্রমোহন।

উপসনা তত্ত্বের মধ্যেই শাক্তপদাবলীর মূলকথা নিহিত। কেননা এই শক্তি উপাসনা যাদুবিদ্যা রসনাতৃপ্তির বা দৈহিক লালসা পরিতৃপ্তির উপাসনা নয়। এ হল মোহাবৃত সঙ্কুচিত মানবসত্তার আবরণ উন্মোচনের সাধনা; মানুকে শ্রীদ্বারা, শক্তিদ্বারা বিভূতিদ্বারা মণ্ডিত করার সাধনা, জীবনকে অপূর্ব ছন্দে ও দীপ্তিতে পরিপূর্ণ করে তুলবার সাধনা। তাই শাক্তপদাবলীর সাধনাকে উপলব্ধি করার একমাত্র চরমতম পথ হল উপাসনাতত্ত্ব। এখানেই আছে শক্তিপূজার রহস্য, শক্তি উপাসনার দ্বারা মনোভাব সিদ্ধ করার অভিপ্রায়, উপাসনার নানা বিধ গূঢ় পদ্ধতি, তান্ত্রিক যোগাচার জাতীয় কোন আচার অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত। আর এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রচিত পদগুলিকেই সাধন সঙ্গীত বলা হয়। শক্তি সাধক নিজধ্যানে জগন্মতার যে রূপ মূর্তির কল্পনা করেন, সেই মূর্তির উপাচার সম্মত পূজা ও জ্মানেরর দ্বারা তিনি তাঁর নিজস্ব প্রার্থনা পূর্তির প্রত্যাশা করেন। সুতরাং সেইরূপ কল্পনামূলক পদগুলিকে সাধন সঙ্গীত আমরা বলতে পারি।

তন্ত্রের সাধন প্রণালী সর্বদা ক্রিয়ামূলক। এটি বিবিধ ক্রিয়ার নির্দ্দেশে পূর্ণ। সাধকগণ লক্ষ্য করেছেন সাধনার অতি প্রম স্তর প্রয়োজন ভাব ও ভক্তি। ইষ্টের প্তুতি প্রগাঢ় ভক্তি না জন্মালে সকল সাধনা ব্যর্থ। ভক্তি শাস্ত্রে একেই

বলে শ্রদ্ধা। "আদৌ শ্রদ্ধা"- এই শ্রদ্ধার উদয় হলেই দেবতা লাভ করার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। শ্রদ্ধাই ভাবকে উদ্দীপিত করে প্রাণময় আগ্রহে তখন হৃদয় আলোড়িত হতে থাকে। ভাব ও ভক্তির মধ্যেই অন্ধ তমসাবৃত অন্তরের প্রথম জাগরণ ঘতে। এমনি কেবল ভাব দিয়েও চরম প্রাপ্য লাভ করা সম্ভব।

শাক্তপদাবলীর খণ্ড ক্ষুদ্র সঙ্গীতের মধ্যে শক্তি সাধক কবিগণ তান্ত্রিক উপাসনার সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে প্রতিফলিত করেছেন-দিব্যভাবের অতিসুন্দর লক্ষের কথা ভাষা ছন্দে গৌড়জন বাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আর এই প্রচেষ্ঠার এক মহান শিল্পী সাধক কবি ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী বিংশ শতাব্দীর সমাজ প্রেক্ষাপটে এক নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন- "গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।"তাঁর এই প্রতিভার স্বাক্ষর স্বরূপ যে গান গুলি আমরা পাই সেই গান গুলির মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন উপাসনার সহজ সরল একমাত্র মত ও পথ। যেমন বলেছেন-

"কালী বল কালী বল,, মনটী আমার।
হাসি মাখা বদনে,, ছল ছল নয়নে,,
আনন্দ কাননে, (মন) ঘোর অনিবার।।"[৩৩] *(গান নং- ৩৯৬)*

গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির পদেও ভবেন্দ্রমোহন সহজ সরল ভাবেই সাধনার এই পথকে ব্যক্ত করেছেন। সারল্য তাঁর একমাত্র অলংকার। জগৎসারে লকালী মায়ের নামই সর্বাপেক্ষা সত্য, এটি বুঝেছেন বলেই তাঁর সাধনায় চরম সত্য এই কালী নাম। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দেহ, মন, প্রাণ, দুচোখ ভরে শুধু কালী নামে নিজেকে ডুবিয়ে দাও। এই নাম ছাড়া যে মানব জাতির মুক্তি নাই সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন-

"গতি নাই,, গতি নাই,,কালী নাম ছাড়া
কণ্ঠ ভরিয়া গাহ,, হয়ে আত্ম হারা।"[৩৪] *(গান নং- ৩৯৬)*

মানুষের জীবন তো জগৎ সংসারে চিরস্থায়ী নয়। বেঁচে থাকতে জীবন পথ যেমন কালী নাম ছাড়া মুক্তি নেই তেমনি জীবনে যদি মৃত্যুও আসে তবুও কালী নাম ছাড়া মানব জাতীর মুক্তি নেই। জীবন থেকে মৃত্যু মানুষের এই পথ পরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্তের একমাত্র নির্ভর স্থল হল কালী নাম। এই কালী নামে জীবন-বিষয় সংসার সব কিছুই ভরিয়ে দেওয়ার জন্য ডাক দিয়ে বললেন ভবেন্দ্রমোহন-

"কত দিন আর,, রবে তুমি,, এই ধরা ধামে,,
মরণ তোমার যদি মজ কালী নামে।
ভবাপাগলা কহে,, প্রাণ থাকিতে দেহে,,
কালী নামে ভরে দাও,, বিষয়,, সংসার।।"[৩৫] *(গান নং- ৩৯৬)*

ভবেন্দ্রমোহন ছিলেন এক ব্যতিক্রমী সাধক কবি। তাই তাঁর সব কিছুই আর পাঁচজনের থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা। নিজে যেমন আজীবন বৈষয়িক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কে নির্বাসন দিয়ে মানুষের বাঁচার যে ন্যূনতম প্রয়োজন সেটুকুকেই আশ্রয় করে জীবনভোর কালী মায়ের চরণে আশ্রয়ে জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু এই পথ সাধারণ মানুষের পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে তিনি ছিলেন অবগত তাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অলসতার আচ্ছন্নতাকে কাটাতে তিনি কালী নামের অশ্রয় নিতে বলেছেন-

"প্রভাতে উঠিয়া কহ কালী, কালী কালী।
চিত্ত শুদ্ধ কর,, জবা তুলি,, জবা তুলি।।"[৩৬] *(গান নং- ৪৩৪)*

জীবনের শুরু প্রভাত কালে কালী নামের মধ্য দিয়ে করার আহ্বান তিনি দি।এন। সেই সঙ্গে কালীমায়ের পূজোর প্রধান অর্ঘ্য যে জবা ফুল সেই ফুল তুলে মাতৃ চরণে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে চিত্তকে শুদ্ধ করা যায় সে কথাও তিনি শোনালেন আমাদের। কথিত আছে যে ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর এক ধনী শিষ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অলসতা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর এই গান রচনা। এই গানের শেষ স্তবকে কালী নাম জপের মধ্য দিয়ে মাতৃপদে আশ্রয়ের পথ দেখালেন–

"অলস ত্যাজিয়া ওরে, জপ কালী নাম,,
অন্তিমে মাতৃপদে লভিতে বিশ্রাম।"[৩৭] *(গান নং– ৪৮৯)*

ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরী মাতৃ আরাধনার ক্ষেত্রে মা কালীকে 'কালী' নামের মধ্যেই সীমা বদ্ধ রাখেননি। অর্থাৎ তিনি মাকে কখনো কালী, কখনো কৃষ্ণ নামে ভজনা করে বলছেন–

"কণ্ঠে কণ্ঠে গাহ কালী নাম,,
গাহ কৃষ্ণ নাম,,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে মুরারে,, মধুর সুরে,,
ভরে দাও মন,, এহেন সংসার।।"[৩৮] *(গান নং– ২৯৯)*

সংসার জীবন দেবতাকে আরাধনার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন, কেউ শৈব মত গ্রহণ করেন, আবার কেউ বা শাক্ত মত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ মানুষ মনে করে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে গেলে সেই নির্দিষ্ট দেবতাকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভবেন্দ্রমোহন মানুষের এই চিরাচরিত সনাতনী মত ও পথ কে ভেঙে দিবে কালী– কৃষ্ণ-শিব-আল্লাহ-রসুল সবকে মিশিয়ে ক্ষুদ্র জাতপাতের বিচারের ঊর্দ্ধে ওঠে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে মানুষের জয়গান গেয়ে মানবতার বিজয় পতাকা ওড়ালেন। শোনালেন সেই পথ ও মতকে, যেখানে প্রতিটি মানুষই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমরা সবাই সবার জন্যই; যেখানে সকল মানুষের সমান অধিকার। যে অধিকারকে কোন স্বার্থান্বেষী মানুষ বা গোষ্ঠী কেড়ে নিতে পারবে না। তাইতো তিনি বলেছেন–

"(এতে) জাত নাই,, কূল নাই,, সমান অধিকার,,
সবারই তরে,, সবাই আমরা সবাই অবতার।
কালী-কৃষ্ণ-আল্লাহ-রসুল বাঁধা একই সুরে।"[৩৯] *(গান নং– ২৩৯)*

কি অপূর্ব কথা খুব সহজ সরল ভাবে শোনালেন আমাদের। কালী, কৃষ্ণ, আল্লাহ মূলত যে একই, তাঁরা যে একই সুরে বাঁধা একথা আমরা বুঝি না বা হয়তো বোঝার চেষ্টা করি না বলেই নানান সময়ে সমাজ জীবনে ঘটে নানান বিপর্যয়ের মূল্য চোকাতে হয় যেকোন সম্প্রদায়ের মানুষকে জীবনের মূল্য দিয়ে। যার স্বাক্ষী রয়েছে অতীত ইতিহাসের নানান ঘটনা। তাই মানুষের জীবনের মূল সুরই হচ্ছে মানবতার পথ। যে পপথ থাকবে না কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ, বিদ্বেষ, হিংসা। আর এই বোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চার হলেই আমরা খুঁজে পাবো জীবনে বেঁচে থাকার মূল সুর। যে সুরে মানুষ ও দেবতা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠে একে অপরের বন্ধু স্বরূপ দেখা বলেই কবির বিশ্বাস বাণী ঘোষিত হয়েছে–

"ঘৃণা নাই,,লজ্জা নাই,, নাই-ক'আড়ম্বরী,
(এ যে) পরমার্থ,, সবার বন্ধু,, এ যে পারের কড়ি।
দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়,, ভুলিয়ে রাখে পাগল করে।।"[৪০] *(গান নং– ২৯৯)*

মনের বিশ্বাস নিয়ে প্রাণ ভরে ভক্তি দিয়ে একাগ্রচিত্তে কালী–কৃষ্ণ-আল্লাহ-রসুল যাকেই আমরা ভজন করি, সেই ভজনের মধ্যে দিয়েই যে দুষ্ট দমন হবে আর এই ভজন সাধনই যেসকল তীর্থ ধামের সমান সেই মতই ব্যক্ত করলেন ভবেন্দ্রমোহন–

"যে যেখানে আছ,, আছরে মন, জপ ইষ্টনাম,,

(এতে) দুষ্ট দমন,, ভজন সাধন,, এতেই যত তীর্থ ধাম।"[৪১] *(গান নং- ৩৯৬)*

'কবি' বা 'সাধক' কোন একটি নামের দ্বারা ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর জীবৎ কালে রচিত যে অসংখ্য গান; যে গান গুলি তাঁর নিজের ভাষায় 'সাধনা সঙ্গীত'। সেই সাধনা সঙ্গীতে ফুটে উঠেছে সাধনার নানান বৈচিত্র্য পূর্ণ এক নতুন মত ও পথের কথা। কেননা তিনি নিজে আজীবন কালীমূর্তির উপাসনা করলেও সেই সঙ্গে 'শিব', 'রাধাকৃষ্ণ'এর ও উপাসনা করেছেন। এমন কি তাঁর কালে মুর্শিদাবাদের তৎকালীন তুকী রেজার বাড়িতে একটানা তিনমাস মুসলিম বেশে কোরান পাঠ করেছেন এ তথ্য সত্য এবং আমাদের সকলের জানা। এখন প্রশ্ন হল কেন তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত ও পথকে আশ্রয় করেছেন? তাই নয় নিজেকে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বলেই মুসলিম ধর্মের গুঢ় কথা উপলব্ধি করার প্রয়াস নিয়েছেন। ফল স্বরূপ তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত সাধনায় ফুটে উঠেছে নিজ জীবনের নানান জ্ঞান, বিশ্বাস, আত্মোপলব্ধির কথা যা আমাদের অবাক করে।

মাতৃ সাধনার সাধনাপ্রণালী ও সাধনতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময় নানান কবি, সাধক অনেক পদ রচনা করে নিগেদের মত ও বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছেন। তেমনি ভবেন্দ্রমোহন নিজেই সব প্রণালীর শ্রেষ্ট প্রণালীর বলেছেন কেবল মাতৃ নামোচ্চারণকে। ভক্তি উদাসীন বিষয়াসক্ত মর্ত্য বাসীর ইহ জীবনের এই জীবৎ মুহূর্তগুলি অবহেলায় অপব্যয়িত হচ্ছে, এতে বিচলিত হয়েছেন কবি। কেবল ভক্তি যোগ সাধনায় মৃত্যুতাড়িত জীব অবধারিত বিনষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে, এই বিশ্বাসেই তিনি রচনা করেছেন এই গানটি-

"(ঐ) কালীপ্রেম সিন্ধু নীরে ডুবিয়া থাক,,
(ও মন) ডুবিয়া থাক।
অতল তলে তলিয়ে যেয়ে (শুধু) মাকে ডাক,,
(ও মন) মাকে ডাক।"[৪২] *(গান নং- ৩৯৫)*

মাতৃ নামোচ্চারণে নিজেকে সর্বস্ব দিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারলেই জীবনের সমস্ত ব্যথা বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা দূর হয়ে যায় বলেই তাঁর ঘোষণা-

"শীতল হবে দগ্ধ হিয়া,,
দেখরে মন, ডুবটি দিয়া।
রতন-মানিক লও খুঁজিয়া,,
সেই ভূষণে অঙ্গ ঢাক।।"[৪৩] *(গান নং- ৩৯৫)*

আমরা জীবনের মূল্যবান সময়ে কোন মূল্য না দিয়ে অবহেলায় নিজেকে হারিয়ে দিয়ে আপসোস করি। কিন্তু যদি আমরা নিজেকে শুধরে নিয়ে ভুল পথে চালিত না করে খুঁজে পাই জীবনের সঠিক পথ, তাহলেই সুখ সাগরের আনন্দ ভেলায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারব। আর এ জন্যি আমাদের কি করতে হবে সে কথাই এই গানেরই পরের স্তবকে ব্যক্ত করা হয়েছে-

"নাইকো সেথায় ব্যথার জ্বালা,,
আনন্দেরই মহামেলা।
খেলেছ মন, অনেক খেলা
অবহেলায় লাখ লাখ।"[৪৪] *(গান নং- ৩৯৫)*

মাতৃনামে ডুবিয়ে রাখলে যে কোন ভয় বা বিপদ হবে না সে কথা যেমন কবি সাধক ভবেন্দ্রমোহন নিজে বিশ্বাস করেন বলেই তিনি সর্বদা নিজেকে মাতৃনামে ডুবিয়ে রাখার আকুল প্রার্থনা করেছেন মা-এরই কাছে; তেমনি অন্যদের ও সেই পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সেই বিশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন এই গানেরই শেষাংশে–

"ঝড় তুফানে নাই কোন ভয়,,
(যে) প্রেম সাগরে ডুবিয়া রয়।
ভবা পাগলা ডাকিয়া কয়,,
মা গো, আমায় ডুবিয়ে রাখ।"[৪৫] *(গান নং- ৩৯৫)*

ভবেন্দ্রমোহনের সাধনার রহস্যচিন্তা লঘু হয়ে এসেছে। সেই স্থানে বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে কবি সাধকের উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে উপলব্ধ সর্বদেবতার ঐক্যতত্ত্ব। এই ঐক্যতত্ত্ব ব্যাখ্যানে তাঁর কল্পনা প্রতি পদেই অভিনব, প্রতি গীতেই নতুন শব্দ রূপকে অলংকৃত।

তথাকথিত শাক্তপদ বিষয়ের দিক থেকে শাক্তগীতি হলেও রীতির দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক গীতিকবিতা হতে পেরেছে। উদার ভক্তির আবেদনই সেই জাতীয় পদে বেশি। তন্ত্র মন্ত্রের কথা, গোপন সাধন পদ্ধতি ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বিশেষত ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর পদে তেমন নেই। তাই আধুনিক গীতিকবিতার অকপট আত্মপ্রকাশের পথে শাক্তপদ যেন অনেকটা এগিয়ে এসেছে। পারিপার্শ্বিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষে, কবিরা- যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা অস্তিত্বের চরম সংকটে মাতৃ নামের ভূমি টুকু আঁকড়ে ধরেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি ভবেন্দ্রমোহন যেসব পদ রচনা করেছেন সে সর্ম্পকে একথা আরও বেশি সত্য। সে জন্যই শাক্ত পদাবলীর প্রতি আধুনিক পাঠকের আগ্রহ কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে যে ভক্তি প্রাণতা ও মাতৃব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তা সার্বজনীন।

শাক্ত কবিতার জন্ম বাঙালীর তন্ত্র সাধন ও শাক্ত উপাসনার মধ্য দিয়েই হোক, অথবা ঐশীলীলার প্রতি সাধকের বিস্ময় প্রকাশের তার বিস্তার ঘটুক সঙ্গীতের স্বাভাবিক আকর্ষকত্ব ও কাব্যের নিজস্ব সূত্র অনুস্মরণ করে শাক্তগীতি পদাবলী বাংলা গীতি কবিতার একটি মহত্তর ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে। তাই পৃথিবীর অনেক ধর্ম সাহিত্যের মতই শাক্ত পদাবলীর রস গ্রহণের জন্যও ধর্ম বিশ্বাস কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। বিশেষত শাক্ত কবি ভবেন্দ্রমোহনের জীবনাসক্তি ও বাৎসল্য, সংসার চেতনা ও বাস্তব বেদনা, জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে জগজ্জননী অসীম রূপে অন্বেষণ, নিবিড় আত্মমগ্ন অনুরাগে মাতৃনাম উচ্চারণ এগুলিই জীবনধর্মী সাহিত্যে পর্যবসিত করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১) ক্ষেত্রী, সম্পাদক আচার্য গোপাল, ১৯৮৮, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ- ১, কলকাতা-০৯, নলিনী প্রকাশনী, পৃ- ৫।
২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তমোনাশ, ১৯৯৩, মায়ের বাণী ভবার বাণী, উত্তর চব্বিশ পরগণা : জবাভবা প্রকাশনী, পৃ -৯।
৩) দাস, জয়নারায়ণ, ১৯৯৬, সাগর পারের হরবোলা, কলকাতা, প্রকাশক শ্রী শশী ক্ষেত্রী, পৃ-১২।
৪) বসু, অরুণকুমার, ২০১৪, নব সংস্করণ, শাক্ত পদাবলী, কলকাতা, গ্রন্থবিকাশ, পৃ-৭৫।

৫) চট্টোপাধ্যায় হীরেন, ২০১৩, শাক্ত পদাবলী পরিক্রমা : তত্ত্ব ও কাব্যরূপ, কলকাতা ০৯, দে'জ পাবলিশিং, পৃ- ২৪১।
৬) ক্ষেত্রী, সম্পাদক আচার্য গোপাল, ১৯৮৮, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ- ১, কলকাতা-০৯, নলিনী প্রকাশনী, পৃ- ৩৮৪।
৭) ঐ, পৃ- ৪৭৯।
৮) আচার্য ড. রামজীবন, ২০০৫, শাক্ত পদাবলী : ভাব-রূপ-প্রতিমা, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, পৃ- ৭১।
৯) ক্ষেত্রী, সম্পাদক আচার্য গোপাল, ১৯৮৮, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ- ১, কলকাতা-০৯, নলিনী প্রকাশনী, পৃ-৪৩০।
১০) ঐ, পৃ- ৫১১।
১১) চট্টোপাধ্যায় হীরেন, ২০১৩, শাক্ত পদাবলী পরিক্রমা : তত্ত্ব ও কাব্যরূপ, কলকাতা ০৯, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-২৪৩
১২) ক্ষেত্রী, সম্পাদক আচার্য গোপাল, ১৯৮৮, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ- ১, কলকাতা-০৯, নলিনী প্রকাশনী, পৃ-৫১১।
১৩) ঐ, পৃ- ৫০৮।
১৪) ঐ, পৃ- ৩১২।
১৫) ঐ, পৃ- ৩১২।
১৬) ঐ, পৃ- ৪০৫।
১৭) ক্ষেত্রী, আচার্য গোপাল, ২০১০, ভবারছন্দে ভবার জীবন লীলা, কলকাতা, সাধনা প্রেম, পৃ- ২।
১৮) ঐ, পৃ- ২।
১৯) ঐ, পৃ- ২।
২০) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তমোনাশ, ২০০৬, পরমগুরু ভবাপাগলা, কলকাতা, নলিনী প্রকাশনী, পৃ -৫৪।
২১) ক্ষেত্রী, সম্পাদক আচার্য গোপাল, ১৯৮৮, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ- ১, কলকাতা-০৯, নলিনী প্রকাশনী, পৃ- ৫১৪।
২২) ঐ, পৃ- ৫১৪।
২৩) ঐ, পৃ- ৫১৪।
২৪) ঐ, পৃ- ৪৪৮।
২৫) ঐ, পৃ- ৪৪৮।
২৬) ঐ, পৃ- ৪৪৮।
২৭) ঐ, পৃ- ৪৪৮।
২৮) মণ্ডল, সম্পাদক দয়াময়, ২০১২, কাজী নজরুল ইসলাম ও সঞ্চিতা, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ- ৫৬, ৫৭
২৯) ক্ষেত্রী, সম্পাদক আচার্য গোপাল, ১৯৮৮, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ- ১, কলকাতা-০৯, নলিনী প্রকাশনী, পৃ- ৫১৪।
৩০) ঐ, পৃ- ১০৭।
৩১) ঐ, পৃ- ৩৯২।
৩২) ঐ, পৃ- ৩৯২।
৩৩) ঐ, পৃ- ৪১৬।
৩৪) ঐ, পৃ- ৪১৬।
৩৫) ঐ, পৃ- ৪১৬।

৩৬) ঐ, পৃ- ৪৫৮।
৩৭) ঐ, পৃ- ৪৫৮।
৩৮) ঐ, পৃ- ৩১৫।
৩৯) ঐ, পৃ- ৩১৫।
৪০) ঐ, পৃ- ৩১৫।
৪১) ঐ, পৃ- ৩১৫।
৪২) ঐ, পৃ- ৪১৫।
৪৩) ঐ, পৃ- ৪১৫।
৪৪) ঐ, পৃ- ৪১৫।
৪৫) ঐ, পৃ- ৪১৫।